দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন পরীক্ষা পদ্ধতি কার্যকর করা প্রসঙ্গে

২০০৫ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে মাধ্যমিক স্তরে একমুখি শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য এক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। একমুখি শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য সরকারি পর্যায়ে বহু কর্মশালা, আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হওয়া ছাড়াও প্রচুর অর্থও ব্যয় হয়েছে। সচেতন সমাজের প্রবল বাধার মুখে একমুখি শিক্ষা ব্যবস্থা সরকার স্থগিত করতে বাধ্য হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রজ্ঞাপনের অপর অংশটি 'বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি' স্থগিত না করে যথারীতি বহাল রাখা হয় এবং তা চালু করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়া হয়েছে জোর তাগিদ।

কিন্তু বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। এ পদ্ধতিরও রয়েছে বহু ত্রুটি। ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে এ পদ্ধতি চালু করলে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান আরও নিচে নেমে যাবে বলে মনে করি। এ পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো—

এ পদ্ধতি অনুযায়ী ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণী ও বিষয়ে ৩০ নম্বর শিক্ষকের হাতে থাকবে। শিক্ষক শ্রেণীতে উপস্থিতি, অ্যাসাইনমেন্ট, বক্তব্য উপস্থাপন, নিয়মানুবর্তিতা, খেলাধুলায় কৃতিত্ব, মূল্যায়ন, আচরণ, নেতৃত্ব, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ, বিজ্ঞান বিষয় ক্লাসে অগ্রহ ইত্যাদি পরিমাপকসমূহের ওপর ৩ × ১০ = ৩০ নম্বর প্রতি ছাত্রকে বিষয়ভিত্তিক প্রদান করবেন। এই পদ্ধতিতে নম্বর প্রদান করা হলে নিম্নলিখিত কারণে শিক্ষার গুণগত মান নিম্নগামী হবে—

১. ৩০ নম্বর দেয়া হলে বাকি ৭০ নম্বর টিউটরিয়াল, নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা, রচনামূলক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা এই চারটি ভাগে ভাগ হবে। এতে পরীক্ষার্থী কোনো অংশেরই পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন করতে সক্ষম হবে না। বিষয়ভিত্তিক মেধা বিকাশে দেখা দেবে প্রতিবন্ধকতা।

২. মোট ৩০ নম্বরই কোনো ছাত্র পেলে বাকি ৭০ নম্বরের মধ্যে কেবল ৩ নম্বর পেয়ে মোট ৩৩ নম্বর পেলেই কি তার পাস হবে? (অর্থাৎ অংশভিত্তিক পাস নম্বরের কোনো উল্লেখ নেই)।

৩. আমাদের দেশে অঞ্চল ও এলাকাভেদে বিদ্যালয়গুলোর মান, শৃঙ্খলা, পরিবেশ, পরীক্ষার ফলাফল, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদির যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এ পদ্ধতি কার্যকর হলে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রকে ঐ ৩০ নম্বর প্রদানে বাধ্য হবেন (এলাকার ব্যক্তিবর্গের প্রভাবে)।

৪. এই পদ্ধতি কার্যকর হলে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশনের প্রবণতা বাড়বে।

৫. নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে পাসের হার বাড়লেও শিক্ষার গুণগত মান বাড়েনি। একইভাবে এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন হলে দেশের শিক্ষার গুণগত মানে ধস নামবে।

৬. যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা রয়েছে সেসব বিষয়ে এ পদ্ধতি নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যবহারিক নৈর্ব্যক্তিক নম্বর বাদ দেয়ার পর কেবল সাড়ে বাইশ নম্বরের রচনামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, যা একটি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশে সহায়ক নয়।

অতএব উল্লিখিত ত্রুটিসমূহ বিবেচনা করে সময় নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই শ্রেয়।

মো. মনসুর আলী মিয়া,
অধ্যক্ষ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজ, সাভার, ঢাকা।